স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

# হাইপোথাইরয়েডিজম

ডাঃ মোঃ বদরুল ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি
ডাঃ তাহমিনা ইসলাম, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

লীনার বয়স ২৫ বছর। তিন বছর আগে তার বিয়ে হয়। বিয়ের দু'বছরের মাথায় তার কোল আলো করে জন্ম নেয় ফুটফুটে মাহিন। স্বামী, স্ত্রী আর ছোট্ট মাহিনের সংসারটি ছিলো একটি সুখী পরিবার। কিন্তু মাহিনের জন্মের ছয়মাস পর থেকেই সবকিছু কেমন যেন বদলে যেতে থাকে। বিষণ্নতায় পেয়ে বসলো লীনাকে। মেজাজ সবসময় খিটখিটে হয়ে থাকে। সবকিছুর প্রতি কেমন যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলো আর অসম্ভব মুটিয়ে যাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ বাচ্চা কোলে রাখলেই হাত দু'টো ব্যথায় টনটন করে উঠতো। সাজিদের সাথে তার সম্পর্কটাও ভালো যাচ্ছিলো না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্বটাও বেড়ে চলছিলো। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল যেদিন লীনা আত্মহত্যার চেষ্টা করলো। সাজিদ লীনাকে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলো। ডাক্তার বললেন লীনা বিষণ্নতায় ভুগছে, তার চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধেও কোনো কাজ হচ্ছিলো না। বরং আরো মোটা হয়ে যাচ্ছিলো লীনা। মাসের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে প্রচণ্ড ব্যথায় ছটফট করতো আর প্রচুর রক্তক্ষরণ হতো। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েও কোনো লাভ হয় নি। রক্তের হিমোগ্লোবিন ক্রমেই কমে যাচ্ছিলো। শেষটায় শুরু হলো প্রচণ্ড হাত-ব্যথা। রাতে ব্যথায় কাঁদতো লীনা। সাজিদ অসহায় হয়ে পড়লো। শেষ অবলম্বন হিসেবে ওরা একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের দারস্থ হলো। তিনি বললেন লীনার হাতের স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে এমন হচ্ছে। একে বলে কারপাল টানেল সিন্ড্রোম। তিনি কিছু পরীক্ষা দিলেন। ধরা পড়লো লীনা মারাত্মক হাইপোথাইরয়েডিজমে ভুগছে।

তিন বছর পরের চিত্র পুরোই অন্যরকম। লীনা এখন একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ব্যস্ত শিক্ষিকা। সাজিদ আর মাহিনকে নিয়ে ওর সংসারটায় এখন সোনালী আলো পড়ছে। সঠিক চিকিৎসা পেয়ে সে এখন সুস্থ। যদিও ডাক্তার বলেছেন তাকে দীর্ঘদিন ওষুধ খেতে হবে। কিন্তু তাতে কী, সে তো ফিরে পেয়েছে তার আগের জীবন, সংসার এবং সবকিছু।

আমাদের গল্পের রোগী একজন থাইরয়েড হরমোন স্বল্পতায় আক্রান্ত ব্যক্তি। এই হরমোনের সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এসব রোগ অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে ধরা পড়ে না। থাইরয়েড হরমোনজনিত রোগের উপসর্গ এতটাই বৈচিত্র্যময় যে, খুব সহজেই তা ডাক্তারদের সন্দেহকেও এড়িয়ে যায়।

## থাইরয়েড গ্রন্থি, হরমোন ও আয়োডিন

থাইরয়েড গ্রন্থিটি আমাদের গলার সম্মুখভাগে থাকে। জীবনের বিশেষ কিছু সময় যেমন গর্ভাবস্থায় বা কৈশোরের বাড়ন্ত সময়ে ছাড়া এটি সাধারণত দৃশ্যমান হয় না। এই সময়গুলোতে শরীরের বাড়তি প্রয়োজনের তাগিদে এটি কিছুটা বড় হয়, তবে কখনোই গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের মতো বড় হয় না। আমাদের মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থির আদেশেই এই গ্রন্থিটি শরীরের প্রয়োজন মোতাবেক থাইরয়েড হরমোন তৈরি করে। হরমোন এই গ্রন্থি থেকে রক্তে নিঃসৃত হয়ে শরীরের দূর দূরান্তের অঙ্গ ও কোষকলার ওপর কাজ করে। আয়োডিন থাইরয়েড হরমোন বা থাইরক্সিনের একটি অপরিহার্য উপাদান। আমরা শুধুমাত্র খাবার ও পানি থেকে এটি পেয়ে থাকি। খাদ্যের আয়োডিন রক্তের সাথে মিশে থাইরয়েড গ্রন্থিতে পৌঁছায় এবং থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য কাজ করে।

## থাইরয়েড হরমোনের কাজ

থাইরয়েড হরমোনের কাজসমূহ নিম্নরূপ:

১. শারীরিক বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে

২. আমিষ, শর্করা এবং চর্বির বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে

৩. অন্যান্য হরমোন, যেমন গ্রোথ হরমোন এবং এড্রেনালিন হরমোনের কাজের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে

## হাইপোথাইরয়েডিজম

যেকোনোভাবেই হোক শরীরে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে সে অবস্থাকে

ডাক্তার রোগীর থাইরয়েড গ্রন্থি পরীক্ষা করে দেখছেন

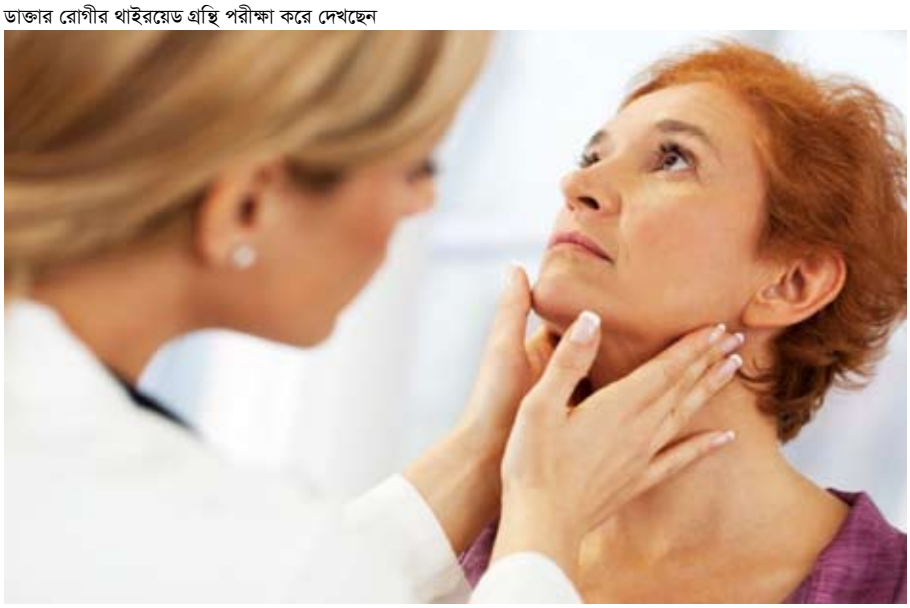

ভেতরের পাতায়

- র‍্যাবিস বা জলাতঙ্ক
- সিলিকোসিস
- এন্ডোস্কোপি সম্পর্কে জানুন

বর্ষ ২৩ | সংখ্যা ৩
চৈত্র ১৪২১ | এপ্রিল ২০১৫
ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

## স্বাস্থ্য সংলাপ

**সম্পাদনা পরিষদ**

| | |
|---|---|
| প্রধান সম্পাদক | অধ্যাপক জন ডি. ক্লেমেন্স |
| উপ-প্রধান সম্পাদক | ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্ধন |
| ব্যবস্থাপনা সম্পাদক | মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা |
| সম্পাদক | সৈয়দ হাসিবুল হাসান |

**সদস্য**

ডাঃ রুখসানা গাজী, ডাঃ মোঃ ইকবাল, ড. রুবহানা রকিব, ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম, ড. শামসুন নাহার, ডাঃ মারুফা সুলতানা

| | |
|---|---|
| সহযোগিতায় | হামিদা আক্তার |
| পৃষ্ঠাবিন্যাস | সৈয়দ হাসিবুল হাসান |

**কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন**

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

**প্রকাশক**

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

হাইপোথাইরয়েডিজম বলে। বেশিরভাগ সময়েই এই হরমোন প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে এটি হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০০ জনে ৫ জন এই রোগে আক্রান্ত। তবে, বাংলাদেশে এ-বিষয়ে সাম্প্রতিককালে কোনো জরিপ পরিচালিত হয় নি। নারীদের এ-রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় ৬ গুণ বেশি। বৈশ্বিক অবস্থানভেদে হাইপোথাইরয়েডিজমের কারণ বিভিন্ন। উন্নত দেশসমূহে প্রক্রিয়াজাত খাবারে আয়োডিনের সংযুক্তির কারণে সেসব দেশে হাইপোথাইরয়েডিজমের হার কম। এসব দেশে মূলত একধরনের থাইরয়েডের প্রদাহ (হাসিমোটো থাইরয়েডাইটিস) থেকে এই রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে প্রধানত খাবারে আয়োডিনের অভাবে এ-রোগ হয়। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে এ-রোগের প্রকোপ বেশি কারণ সেখানকার পানি ও খাবারে আয়োডিন কম থাকে। এছাড়া, হাইপারথাইরয়েডিজমের চিকিৎসায় যে রেডিও-আয়োডিন বা এন্টিথাইরয়েড ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা থেকে এবং থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সারের কারণে সম্পূর্ণ থাইরয়েড গ্রন্থি অপারেশন করে ফেলে দিলেও পরবর্তীতে হাইপোথাইরয়েডিজম দেখা দিতে পারে।

## হাইপোথাইরয়োডিজমের লক্ষণসমূহ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট থাকে না। ৩০ থেকে ৫০ বছর-বয়সী মানুষের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুটিয়ে-যাওয়া, মানসিক অবসাদগ্রস্ততা, ত্বকের লাবণ্য কমে গিয়ে খসখসে ভাব-হওয়া, গলার স্বর মোটা-হওয়া, চুল পড়ে-যাওয়া এবং হাতে ব্যথার উপসর্গ থাকলে অবশ্যই শরীরে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা দেখতে হবে। এসব উপসর্গের পাশাপাশি শীত সহ্য করতে না-পারা, মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, পুরুষদের যৌনক্ষমতা কমে-যাওয়া এবং মানসিক বিকারগ্রস্ততা উপসর্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে। শারীরিক পরীক্ষায় রোগীর নাড়ির স্পন্দনে অস্বাভাবিক ধীর গতি, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তস্বল্পতা, শারীরিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমতে পারে।

**থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতিজনিত সংজ্ঞাহীনতা (মিক্সিডিমা কোমা):** এটি হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য একটি মারাত্মক অবস্থা। এতে মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ শতাংশ। হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ-সময় রোগীর শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় এবং খিঁচুনিও হতে পারে। হাইপোথাইরয়েডিজমের অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ সাধারণত দৃশ্যমান থাকে। তবে চেতনা হারানোর অন্যান্য কারণও অবশ্যই খতিয়ে দেখা দরকার। মারাত্মক ধরনের কোনো সংক্রমণ বা ইনফেকশন, শরীরে লবণের তারতম্য, ওষুধের প্রভাব, হৃদযন্ত্রের অকার্যকারিতা প্রভৃতি কারণে বয়স্ক রোগীরা সহজেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে এবং হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এর হার অনেক বেশি।

## হাইপোথাইরয়েডিজমের কারণ

### গলগণ্ড বা ঘ্যাগ

শরীরের বাড়তি প্রয়োজনে (গর্ভাবস্থায় বা বয়সন্ধিকালে) থাইরয়েড গ্রন্থি যদি কোনো কারণে আয়োডিন ব্যবহার করতে না-পারে অথবা আয়োডিনের অভাব হলে গ্রন্থির কোষসমূহ দ্রুত বিভাজন হয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে, যাকে হাইপারপ্লাসিয়া বলা হয়। এতে গ্রন্থিটি বড় হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এটি ২-৩ গুণ বড় হয় যা গলার সামনে কিছুটা দৃশ্যমান হয়। এই অবস্থাকে সিম্পল গয়টার বা সাধারণ গলগণ্ড বা ঘ্যাগ বলা হয়। আয়োডিনের বাড়তি চাহিদা বা আয়োডিনের ঘাটতিজনিত হরমোনের অভাব পূরণের জন্যে খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করলে এই সাধারণ গয়টার আবার আগের মতো স্বাভাবিক গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়। আয়োডিনের এই অভাব সংশোধন করা না-হলে গ্রন্থিটি এতটাই বড় হতে পারে যে তা শ্বাসনালিকে চাপ দিতে পারে বা গলা ছাড়িয়ে বুকের ভেতর পর্যন্ত বাড়তে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই গলগণ্ড হবার প্রবণতা সবার এক নয়। গলগণ্ডপ্রবণ অঞ্চলগুলোতেও তাই আয়োডিনের অভাবের পাশাপাশি পারিবারিক একটি যোগসূত্র আছে। কোনো কোনো পরিবারের বংশধরদের ভেতর এটি হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। রোগীর মধ্যে সাধারণত হাইপোথাইরয়েডিজমের উপসর্গ থাকে, তবে কোনো কোনো রোগীর তা না-ও থাকতে পারে।

### হাসিমোটোস থাইরয়েডাইটিস

এটি একটি স্বপ্রতিরোধী বা অটোইমিউন ব্যাধি যা হাইপোথাইরয়েজিমের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এ-রোগে আক্রান্ত রোগীদের রক্তে থাইরয়েড পারঅক্সিডেইজ নামের এন্টিবডি থাকে যার সাথে শ্বেত কণিকার মিলিত প্রদাহে ধীরে-ধীরে থাইরয়েড গ্রন্থিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাইরক্সিন হরমোনের উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং রোগী হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত হয়।

### ক্ষণস্থায়ী থাইরয়েডের প্রদাহ বা ট্রানজিয়েন্ট থাইরয়েডাইটিস

ডি কোয়েরভেইনস থাইরয়েডাইটিস এবং প্রসব-পরবর্তী থাইরয়েডের প্রদাহ (পোস্টপার্টাম

থাইরয়েডাইটিস)—এই দু'টি অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে, যা সাধারণত ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত থাকে এবং পরে আপনা-আপনি ভালো হয়ে যায়।

**সাব-একিউট (ডি কোয়েরভেইনস) থাইরয়েডাইটিস:** বিশেষ কিছু ভাইরাসের সংক্রমণ থাইরয়েড গ্রন্থিকে আক্রান্ত করতে পারে। এই অবস্থাটির বিশেষ লক্ষণ হলো ব্যথা, যদিও সবসময় ব্যথা থাকে না। গলার সামনে যে-অংশে থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে সেই অংশে ব্যথা হয়। ঢোক গেলা, কাশি বা গলার নড়াচড়াতে এই ব্যথা বাড়ে। থাইরয়েড গ্রন্থিটি কিছুটা বড় হয় এবং হাত দিয়ে চাপ দিলেও সেখানে ব্যথা অনুভূত হয়। একই সঙ্গে ভাইরাসের সংক্রমণজনিত কারণে শরীরে ব্যথা, জ্বর-জ্বর ভাব এসবও থাকে। এই সমস্যাগুলোকে ডাক্তার সাধারণ সর্দি-জ্বর ভেবে চিকিৎসা দেন। এই ঘটনার এক-দেড় মাস পরে রোগী হাইপোথাইরয়েডিজমের উপসর্গ নিয়ে আসে। এটি সাধারণত ৪-৬ মাস থাকে এবং এই সময় রোগীকে থাইরক্সিন হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

**প্রসব-পরবর্তী থাইরয়েড প্রদাহ (পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস):** প্রসব-পরবর্তী ৫-১০% মহিলাদের ক্ষেত্রে থাইরয়েডের সমস্যা দেখা যায়। শিশুর জন্মের ৬ মাসের মধ্যে যদি মায়ের হাইপারথায়রয়েডিজমের উপসর্গ দেখা যায় তবে তার সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস। এক্ষেত্রে মায়ের রক্তে এন্টি-থাইরয়েড পারঅক্সিডেইজ নামের এক বিশেষ ধরনের এন্টিবডির উপস্থিতি থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে হাইপারথায়রয়েডিজমের উপসর্গ থাকলেও পরে তা হাইপোথাইরয়েডিজমে রূপ নেয়। আক্রান্ত মায়েদের পরবর্তী গর্ভধারণে এটি হওয়ার প্রবণতা আরো বেড়ে যায় এবং তা স্থায়ী হাইপোথাইরয়েডিজমে রূপ নিতে পারে।

## হাইপোথাইরয়েডিজম নির্ণয়

**রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা নির্ণয়:** রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা এবং থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোনের (TSH) মাত্রাই থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা পরিমাপ করে। শুধুমাত্র রোগ নির্ণয়ই নয় চিকিৎসার কার্যকারিতা নিরূপণেও এর যথাযথ ব্যবহার রয়েছে। রক্তে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH) এবং থাইরয়েড হরমোনের দু'টি যৌগ যথাক্রমে থাইরক্সিন T4 ও ট্রাইআয়োডোথাইরনিন T3 মাপা হয়। হাইপোথাইরয়েড রোগীদের ক্ষেত্রে রক্তে TSH-এর মাত্রা বেশি এবং T4 ও T3-এর মাত্রা কম থাকে।

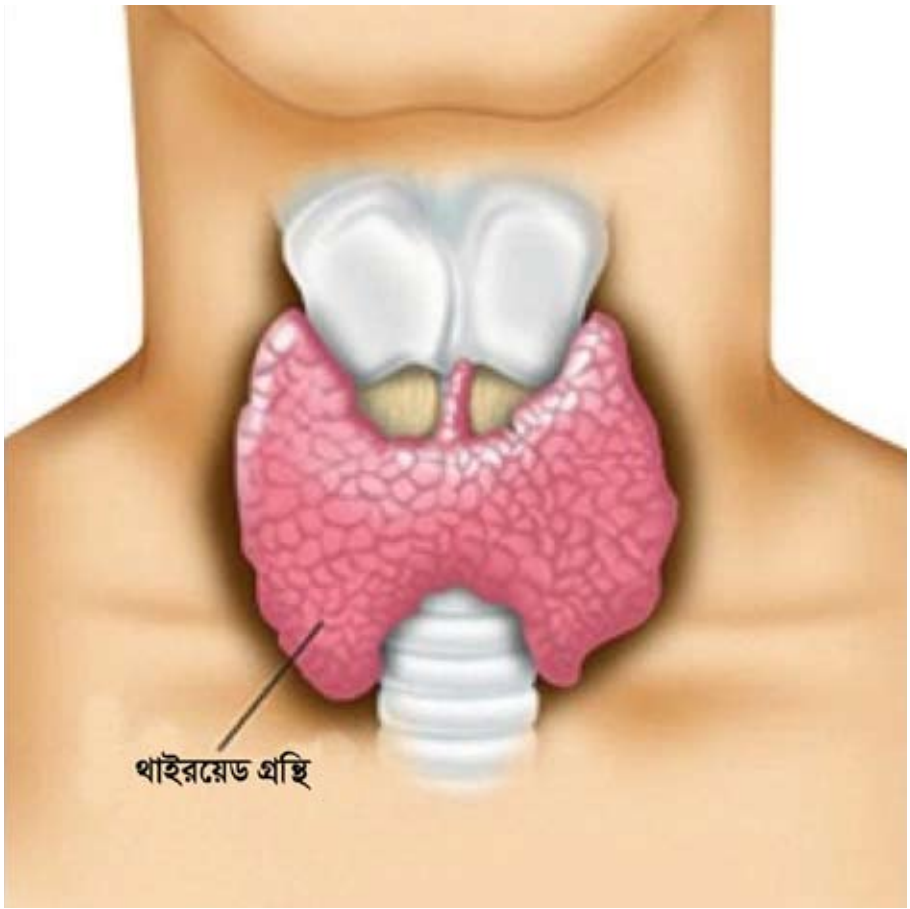


**সাবক্লিনিক্যাল বা অপ্রকাশিত হাইপোথাইরয়েডিজম:** পুরো মাত্রায় হাইপোথাইরয়েডিজমের উপসর্গ প্রকাশের আগে বহু বছর এই অবস্থা বজায় থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মস্তিস্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH)-এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে এবং থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা কমে গিয়ে স্বাভাবিক মাত্রার নিচের সীমানায় অবস্থান করে।

**থাইরয়েড স্ক্যান:** এই পরীক্ষায় রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করে থাইরয়েড গ্রন্থির বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতার একটি হিসাব পাওয়া যায়। রোগের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি স্থির করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

**থাইরয়েড পারঅক্সিডেইজ এন্টিবডি:** হাসিমোটোস থাইরয়েডাইটিস এর সনাক্তকরণে এই এন্টিবডির উপস্থিতি পরীক্ষা করা আবশ্যক। এছাড়া, মহিলাদের যে গর্ভ-পরবর্তী থাইরয়েডাইটিস হয় তাতেও উল্লেখযোগ্য হারে এই এন্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া যায়।

## প্রতিরোধ

আয়োডিনের অভাবজনিত থাইরয়েডের সমস্যার হার সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ আয়োডিন স্বল্পতার ঝুঁকিতে রয়েছে। এক্ষেত্রে এই বিশাল জনগোষ্ঠির মধ্যে হাইপোথাইরয়েডিজম প্রতিরোধে খাদ্য ও পানিতে কৃত্রিমভাবে আয়োডিন সংযোজনই একমাত্র উপায়। বাজারে আয়োডাইজড সল্ট বা আয়োডিনযুক্ত লবণ পাওয়া যায় যা খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করে আয়োডিনের চাহিদা মেটানো যায়।

## চিকিৎসা

হাইপোথাইরয়েডিজমে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি থাকে। কাজেই এক্ষেত্রে চিকিৎসা থাইরক্সিন হরমোন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আজীবন চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। বাজারে বিভিন্ন নামে এই হরমোনের ট্যাবলেট পাওয়া যায়। চিকিৎসার শুরুতে স্বল্পমাত্রার থাইরক্সিন দেওয়া হয়। সাধারণত ৫০ মাইক্রোগ্রাম-এর ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে রোগীরা এই ওষুধ খেয়ে থাকেন। প্রতি ৩ সপ্তাহ পরপর ডোজের মাত্রা প্রতি ৫০ মাইক্রোগ্রাম বাড়ানো উচিত। চূড়ান্তভাবে রোগীকে ১০০ থেকে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম ওষুধ ধারাবাহিকভাবে খেতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ডোজ বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন হতে পারে। ওষুধের মাত্রা ঠিক আছে কি না তা বোঝা যায় রোগীর রক্তে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH)-এর

মাত্রা দেখে। এই হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকলে ধরা হয় থাইরক্সিনের ডোজ যথার্থ।

হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত মায়ের গর্ভাবস্থায় পূর্ববর্তী মাত্রার চেয়ে বেশিমাত্রায় হরমোনের প্রয়োজন পড়ে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধের মাত্রা বাড়ানো বা কমানো এবং প্রতি তিনমাস পরপর রক্তে হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রসবের পর সাধারণত হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

হাইপোথাইরয়েডিজমের সাথে হৃদরোগের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত রোগীরা প্রায়শই হৃৎপিণ্ডের রক্তনালীর অসুখ বা করোনারি আর্টারি ডিজিজে ভুগে থাকে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, থাইরয়েড হরমোন দিয়ে চিকিৎসায় রোগীর হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে, এমনকি হৃদরোগে রোগীর আকস্মিক মৃত্যুও হতে পারে। এই কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগীদের খুবই স্বল্পমাত্রায় হরমোন চিকিৎসা শুরু করতে হয় এবং ধীরেধীরে এই মাত্রা প্রয়োজনমতো বাড়াতে হয়। হৃদরোগের ঝুঁকির কারণে প্রায় ৪০ ভাগ রোগী প্রয়োজনীয় মাত্রায় হরমোন চিকিৎসা নিতে পারে না। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের বাইপাস সার্জারি বা করোনারি স্টেন্টিং-এর প্রয়োজন হতে পারে।

মিক্সিডিমা কোমা একটি জরুরি অবস্থা। নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিইউ মিক্সিডিমা কোমায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার আদর্শ স্থান। এক্ষেত্রে অবশ্যই শিরাপথে থাইরয়েড হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয় এবং রোগীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। এছাড়া, যথাযথ এন্টিবায়োটিক ও অক্সিজেন দিতে হবে এবং অতিরিক্ত স্যালাইন পরিহার করতে হবে কারণ এতে হৃদযন্ত্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগী মারাও যেতে পারে।

## জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম

থাইরয়েড গ্রন্থির জন্মগত ত্রুটির কারণে নবজাতকের হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একে জন্মগত বা কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম বলে। এই অবস্থা থাকলে ভবিষ্যতে শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

### এ-রোগের লক্ষণসমূহ

জন্মের পরপর এ-রোগের কোনো উপসর্গ নাও দেখা দিতে পারে। তবে শিশুর মাথা স্বাভাবিকের তুলনায় বড়-হওয়া, দুর্বলতা, ক্ষীণ কান্নার

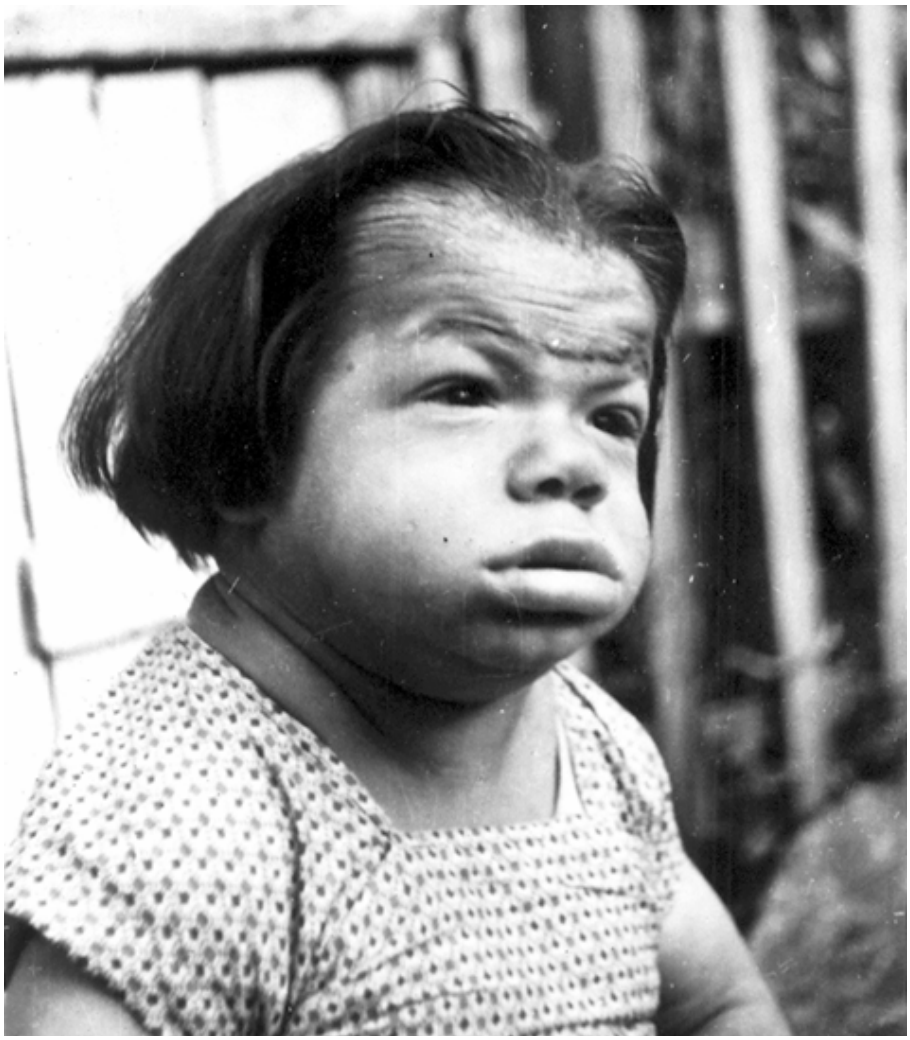

জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত একটি শিশু

আওয়াজ, অতিরিক্ত ঘুমানো, কোষ্ঠকাঠিন্য, দুধ খেতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বিষম-লাগা এসব উপসর্গ থাকলে এ-রোগের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে হবে। এছাড়া, শারীরিক পরীক্ষায় যদি শিশুর দীর্ঘমেয়াদী জন্ডিস ধরা পড়ে, ত্বক খসখসে হয়, পেট ও নাভী ফোলা থাকে, রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয় এবং সর্বোপরি শিশু যদি বেড়ে না-ওঠে, তবে অতিসত্তর জন্মগত হাইপোথা-ইরয়েডিজম আছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

### কারণ

মায়ের আয়োডিনের অভাব থাকলে বা যেসব হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত মা এন্টিথাইরয়েড ওষুধ খায় তাদের শিশুদের জন্মগত হাইপোথা-ইরয়েডিজম হতে পারে। এছাড়া, জন্মগতভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি না-থাকলেও এটি হতে পারে।

### রোগনির্ণয়

জন্মের পরপর শিশুর গর্ভফুলের রক্তে অথবা জন্মের ৫-৭ দিনের মধ্যে শিশুর পায়ের গোড়ালির রক্তে T4 এবং TSH হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম ধরা যায়।

### চিকিৎসা

শিশুদের ক্ষেত্রে থাইরক্সিন ট্যাবলেট নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি বা দুধের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত শিশুর জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা হলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিক থাকে এবং ভবিষ্যতে শিশুকে মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো যায়।

থাইরয়েডের ঘাটতিজনিত রোগ বা হাইপোথা-ইরয়েডিজমের হার আমাদের সমাজে অনেক, যার ক্ষুদ্র একটি অংশই চিহ্নিত হয়ে থাকে। এ-রোগ মানুষের সাধারণ কর্মক্ষমতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকি থাকে। হাইপোথাইরয়েডিজমের উপসর্গ বহুমুখী ও বিচিত্র। এই কারণে এ-রোগের ব্যাপারে সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে থাইরয়েড ফাংশান টেস্ট একটি রুটিন পরীক্ষা। আমাদের দেশেও এটিকে একটি রুটিন পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করা উচিত। ■

# র‍্যাবিস বা জলাতঙ্ক

চৌধুরী মোঃ গালিব, আইসিডিডিআর,বি

উন্নত বিশ্বে প্রায় সব বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্টেই পোষা প্রাণী দেখা যায় এবং এটি একধরনের শখ। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এখন বাংলাদেশেও কিছু মানুষ তাদের শখের প্রাণী ঘরে পোষে। কিন্তু তাদের অনেকেই হয়তো এসব প্রাণীর দ্বারা বাহিত রোগ সম্পর্কে জানে না বা জানলেও এসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। র‍্যাবিস প্রাণীবাহিত এক প্রকার রোগ যা কুকুর, বিড়াল বা বেজীজাতীয় প্রাণীর কামড় অথবা আঁচড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। বাংলাদেশে এই রোগ জলাতঙ্ক নামে বহুল পরিচিত। যদিও এখন পর্যন্ত মফস্বল ও গ্রামের মানুষই এ-রোগে বেশি আক্রান্ত হয়, তবে সচেতন না-হলে ওইসব প্রাণীর কামড়ে যেকেউ এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

আজকের বিশ্বে র‍্যাবিসের প্রকোপ মূলত এশিয়া ও আফ্রিকায় বেশি। এ-রোগে প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৫৫,০০০ মানুষ মারা যায়। বাংলাদেশে র‍্যাবিস অতীতে খুব ভয়াবহ একটি রোগ হিসেবে গণ্য হলেও বর্তমানে এর প্রকোপ কিছুটা কম, তবে এ-রোগ এখনো পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। এখনও বাংলাদেশে অনেক লোক এ-রোগে মারা যায় যার পরিসংখ্যান পরে বর্ণনা করা হয়েছে।

## র‍্যাবিস ভাইরাস যেভাবে ছড়ায়

র‍্যাবিস মূলত Lyssavirus নামের একটি ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়, যা Rhabdoviridae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। একবার মাংসপেশী বা স্নায়ুর সংস্পর্শে আসলে এই ভাইরাস নিজে থেকেই বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ভাইরাসটি মূলত স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থান করে যা আক্রান্ত প্রাণীর লালা দিয়ে বের হয়। তাই আক্রান্ত প্রাণীর কামড়ের মাধ্যমে র‍্যাবিস ছড়ায়। মানুষের ধারণা শুধুমাত্র কুকুরের কামড়েই র‍্যাবিস হয়। এ-ধারণা ঠিক নয়। কুকুরের পাশাপাশি বিড়াল, বেজী, বানর এমনকি কিছু প্রজাতির শিয়ালও এ-রোগের বাহক। সম্প্রতি সাভারে বেজীর কামড়ে র‍্যাবিস হওয়ার একটি খবর পাওয়া গেছে।

## র‍্যাবিসের লক্ষণ

এ-রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে সাধারণত ২-১২ সপ্তাহ সময় লাগে। রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো সাধারণ সর্দি বা কাশি যার সাথে দুর্বলতা, জ্বর ও মাথা-ব্যথা থাকে। পরবর্তীতে রোগীর কামড়ের স্থানে চুলকানি ও অস্বস্তি হয়। পরে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্বাভাবিক আচরণ, মতিভ্রম ও অনিদ্রা দেখা দিতে পারে। এই লক্ষণগুলো ২ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। এ-রোগের আরেকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ হলো জলাতঙ্ক, অর্থাৎ রোগী পানি দেখলেই ভয় পায়। এটি র‍্যাবিসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ল্যারিনজিয়াল প্যারালাইসিসের কারণে রোগী পানি পান করতে পারে না। একবার র‍্যাবিসের লক্ষণ প্রকাশ পেলে রোগীর মৃত্যু প্রায় অনিবার্যই ধরে নেওয়া যায়। আক্রান্ত প্রাণীটির মধ্যেও প্রায় একই রকম লক্ষণ দেখা যায়, যে-কারণে গ্রামে এধরনের কুকুরকে পাগলা কুকুর বলা হয়।

## আক্রান্ত প্রাণী সনাক্তকরণ

আক্রান্ত প্রাণী, বিশেষ করে কুকুরটি, অস্বাভাবিক আচরণ বা আক্রমণাত্মক আচরণ করবে। সে সামনে যাকে দেখবে তাকেই কামড়াতে চাইবে। মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরতে থাকবে। র‍্যাবিস সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রাণীটিকে চেতনানাশক ওষুধের দ্বিগুণ ডোজ প্রয়োগ করে মেরে তার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই পরীক্ষাটি করবেন তার জন্য এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এতে সংক্রমণের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে। তাই এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

## মানুষের র‍্যাবিস নিশ্চিতকরণ

ল্যাবরেটরিতে বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতেই র‍্যাবিস সনাক্ত করা হয়ে থাকে। এজন্য আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন রোগীর লালা, রক্ত, ত্বক বা স্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষা করে র‍্যাবিস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ফ্লুরোসেন্ট এন্টিবডি টেস্ট (FAT)-কে র‍্যাবিস পরীক্ষার জন্য যথাযথ মনে করে। এই প্রক্রিয়ায় টিস্যুতে বিদ্যমান র‍্যাবিস অ্যান্টিজেন ফ্লুরোসেন্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে রোগ নির্নয় করা হয়। এছাড়াও, রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ PCR বা RT-PCR-এর মাধ্যমেও র‍্যাবিস নির্ণয় করা যায়।

## প্রতিকারের প্রচেষ্টা

র‍্যাবিসের চিকিৎসা বলতে এখনও সুনির্দিষ্ট কিছু নেই এবং অতি অল্পসংখ্যক রোগী এ-রোগ হওয়ার পরও আরোগ্য লাভ করে। তাই কোনো প্রাণী, বিশেষ করে র‍্যাবিসের বাহক প্রাণী কামড় দিলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, যেমন:

- কামড়ের স্থান বা ক্ষতস্থান যত দ্রুত সম্ভব পানি অথবা সাবান পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে ক্ষতস্থানে পানিতে দ্রবীভূত আয়োডিন দেওয়া প্রয়োজন। আয়োডিন সংক্রমণের হার হ্রাস করতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরিস্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেললে র‍্যাবিস হওয়ার ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যায়
- দ্রুত র‍্যাবিসের পোষ্ট-এক্সপোজার টিকা নেওয়া প্রয়োজন যা আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। যত দ্রুত এই টিকা নেওয়া যায় ততই ভালো
- যে প্রাণীটি কামড় দিয়েছে তার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। প্রাণীটি যদি কারো পোষা হয়ে থাকে তবে মালিকের সাথে কথা বলে তার সাম্প্রতিক আচরণ সম্পর্কে জেনে নেওয়া উচিত। আর যদি বন্য বা রাস্তার হয় তবে সেটিকে ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা উচিত। প্রাণীটি পোষা বা বন্য যা-ই হোক না কেন যদি জানা যায় যে, র‍্যাবিস-আক্রান্ত তাহলে অবশ্যই সেটিকে সঠিক উপায়ে মেরে ফেলতে হবে।

## বাংলাদেশে র‍্যাবিস

নিচের পরিসংখ্যানে ২০১১ সালের শুরু থেকে ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত র‍্যাবিস রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দেখানো হলো:

সূত্র: সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা

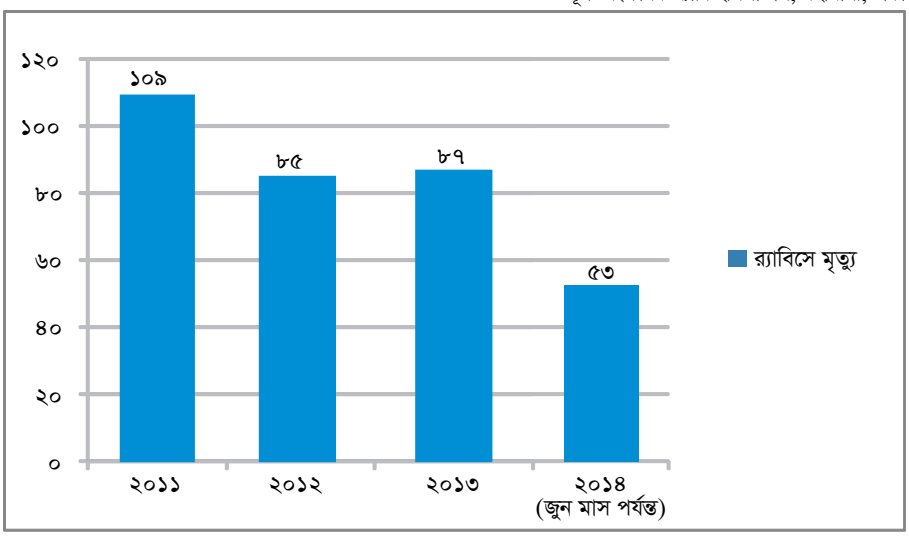


## র‍্যাবিস প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগ

র‍্যাবিস নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার একটি বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচিটি নিম্নোক্ত তিনটি ধাপে বিভক্ত:

১. ২০১০-২০১২: কুকুরের টিকাদান ও রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্ট্রাডারমাল টিকা ক্রয়, কর্মী প্রশিক্ষণ ও পরবর্তী প্রস্তুতি

২. ২০১২-২০১৬: সেল কালচার ইন্ট্রাডারমাল টিকার প্রয়োগ

৩. ২০১৩-২০২০: এ-সময়ের মধ্যে দেশেই সেল কালচার ভ্যাক্সিন উৎপাদন করা

## র‍্যাবিস প্রতিরোধে ব্যক্তিগত উদ্যোগ

প্রথমত: একবার আক্রান্ত হলে এ-রোগে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এই কারণে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি র‍্যাবিস বহন করে এমন কোনো প্রাণী পোষে তবে অবশ্যই প্রাণীটিকে র‍্যাবিসের টিকা দিয়ে আনতে হবে। কোনো পোষা প্রাণী বাজার থেকে কেনার সময় অবশ্যই র‍্যাবিসের টিকা দেওয়া আছে কি না নিশ্চিত হতে হবে, না-দেওয়া থাকলে টিকা দিয়ে আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত: যেসব মানুষের কুকুরসহ র‍্যাবিস বহন করে এমন কোনো পোষা প্রাণী রয়েছে তারাসহ অন্যান্য সকলে, যারা মূলত র‍্যাবিস হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছেন, যেমন পশুপালক, পশুডাক্তার, পশু হাসপাতালের কর্মচারী, ল্যাবরেটরী কর্মী এবং বনে কর্মরত কর্মচারী র‍্যাবিসের টিকা নিলে এ-রোগের ঝুঁকি তাদের মধ্যে অনেকাংশে কমে যেতে পারে।

তৃতীয়ত: ব্যক্তির পোষা প্রাণীটি যদি ছোট হয়, যেমন খরগোস বা গিনিপিগ, তবে তাকে সবসময় রাস্তায় ছেড়ে-রাখা প্রাণীদের কাছ থেকে দূরে রাখা দরকার। লোকালয়ে র‍্যাবিস বহন করে এমন কোনো প্রাণীকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখলে অনতিবিলম্বে তা স্থানীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা জরুরি।

## র‍্যাবিসের টিকা

**প্রি-এক্সপোজার টিকা:** সাধারণত প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে এ-টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এতে মোট চারটি ডোজ থাকে। প্রথম ডোজ দেওয়ার ৭ দিনের মাথায় দ্বিতীয়, ২১ দিনের মাথায় তৃতীয় এবং ২৮ দিনের মাথায় চতুর্থ ডোজ দেওয়া হয়ে থাকে।

**পোস্ট-এক্সপোজার টিকা:** র‍্যাবিসবাহক কোনো প্রাণী কাউকে কামড় দেওয়ার পর র‍্যাবিসের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য তাকে এই টিকা দেওয়া হয়। এতে মোট পাঁচটি ডোজ থাকে। প্রথম ডোজ দেওয়ার ৩ দিনের মাথায় দ্বিতীয়, ৭ দিনের মাথায় তৃতীয়, ১৪ দিনের মাথায় চতুর্থ এবং ২৮ দিনের মাথায় পঞ্চম ডোজ দেওয়া হয়।

সাধারণত বড়দের ক্ষেত্রে হাতের মাংসপেশীতে এবং ছোটদের ক্ষেত্রে পায়ের মাংসপেশীতে টিকা দেওয়া হয়।

র‍্যাবিস রোগটির ভয়াবহতা এবং এটি কীভাবে ছড়ায় তা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি। কুকুর বা অন্য পশুর কামড়ানো বা আঁচড় সম্পর্কেও আমাদের সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার র‍্যাবিস সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য একটি বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ এগিয়ে চলছে। ২০১০ সালে গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে সরকার ২০২০ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ র‍্যাবিসমুক্ত করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি টিকাদান কেন্দ্রে র‍্যাবিসের টিকা রাখা নিশ্চিত করেছে। এছাড়া, সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে এ-টিকা সরবরাহ করারও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে, এ-রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। আর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিতভাবে র‍্যাবিসের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো উচিত। ■

# সিলিকোসিস

ডাঃ মোঃ ফজলুল কবির পাভেল
পাবনা মেডিকেল কলেজ

সিলিকোসিস ফুসফুসের একটি রোগ। এটি খুব পরিচিত কোনো অসুখ নয়। পাথর ভাঙা বা পাথর কাটার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণত এ-রোগ হতে দেখা যায়। নিঃশ্বাসের সাথে পাথরের সিলিকা ফুসফুসে যায়। তারপর এটি সিলিকোসিস রোগ সৃষ্টি করে।

সিলিকা কিন্তু শরীরের ভেতর ঢুকলেই সিলিকোসিস হয় না। সাধারণত একনাগাড়ে ১০-২০ বছর ধরে সিলিকা ফুসফুসে গেলে এ-রোগ হয়। তবে, 'এক্সিলারেটেড সিলিকোসিস'-এর ক্ষেত্রে সিলিকা গ্রহণের ৫-১০ বছরের মধ্যে সিলিকোসিস হতে পারে। কিছু বিরল ক্ষেত্রে ১ বছরের মধ্যেও সিলিকোসিস হতে পারে।

সিলিকোসিসে নিম্নোক্ত উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন:

১। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট

২। কাশি

৩। শারীরিক দুর্বলতা

ফুসফুসে যদি সিলিকা জমা হয় তখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন:

১। জ্বর

২। ওজন কমে-যাওয়া

৩। রাতে অতিরিক্ত ঘাম-হওয়া

৪। বুকে ব্যথা

৫। তীব্র শ্বাসকষ্ট

সিলিকোসিস নির্ণয়ের জন্য ভালোভাবে রোগীর ইতিহাস জেনে নিতে হবে এবং সন্দেহ হলে রোগীর রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে এবং ফুসফুসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে। তাহলে নির্ভুলভাবে রোগটি ধরা যেতে পারে। সিলিকোসিস নির্ণয় করার সাথে-সাথে রোগীর টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষ্মা আছে কি না তা দেখে নেওয়া উচিত, কারণ সিলিকোসিস রোগীদের যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সিলিকোসিসের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। সিলিকোসিস একবার শুরু হলে আর সিলিকা গ্রহণ না-করলেও রোগটি পুরোপুরি সারে না। তাই প্রতিরোধের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কাশি দূর করার জন্য ওষুধ এবং ব্রংকোডায়ালেটর দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। সিলিকোসিস রোগীদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের জীবাণুর সংক্রমণ

সিলিকোসিসে আক্রান্ত একজন রোগী

ঘটতে পারে এবং সেটি হলে চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। ধুমপান না-করলে এবং সিলিকার সংস্পর্শে পুনরায় না-গেলে রোগটি সাধারণত দ্রুত খারাপের দিকে যায় না। তবে এ-রোগ পুরোপুরি ভালো হয় না।

সিলিকোসিস রোগীদের যক্ষ্মা, ক্যান্সার এবং দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ (Chronic obstructive pulmonary disease) হতে দেখা যায়। কিডনীর অসুখের সাথেও সিলিকোসিসের সম্পর্ক আছে। সিলিকোসিসের যেহেতু সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই তাই এটি প্রতিরোধ করাই শ্রেয়। যারা পাথর নিয়ে কাজ করেন তাদের মাস্ক এবং বিশেষ পোশাক পরা উচিত। পাথর ভাঙার কারখানার মালিকদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে যেন তারা তাদের কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। তা না-হলে কারখানা আইনে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কারখানা আইনে যথাযথ বিধান না-থাকলে নতুন আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত।

ধুমপান যেহেতু রোগের তীব্রতা আরো বড়িয়ে দেয়, রোগীকে তাই ধুমপান থেকে একেবারে বিরত থাকতে হবে। বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্যে ধুমপান নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনে প্রকাশ্যে ধুমপানের ক্ষেত্রে শাস্তি ও জরিমানার বিধান রয়েছে। সুতরাং ধুমপানের মাধ্যমে বিষপান থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সকলেরই সচেষ্ট থাকা উচিত। সবশেষে, কারখানার মালিকদের উচিত শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানার পরিবেশ উন্নত করা। তাহলে সিলিকোসিস অনেকটাই কমানো সম্ভব হতে পারে।

পাথর ভাঙার কারখানার শ্রমিকদের এভাবে মাস্ক পরে কাজ করা উচিত

# এন্ডোস্কোপি সম্পর্কে জানুন

ডাঃ সারা আল রাজী, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

## এন্ডোস্কোপি কী

এন্ডোস্কোপি একটি পরীক্ষা পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি রাবারের নল ও একটি ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অংশ দেখা যায়। এর মাধ্যমে শরীরে কোনোরকম কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই ডাক্তার শরীরের ভিতরে দেখতে পারেন।

এই যন্ত্রে একটি রাবারের নল থাকে যা মুখের মধ্যে দিয়ে খাদ্যনালীতে, পায়ুপথে বা শরীরের অন্যান্য অংশে ঢোকানো হয় এবং এর সাথে লাগানো একটি ক্যামেরার মাধ্যমে টিভি স্ক্রিনে শরীরের ভেতরের সমস্ত ছবি দেখা যায়।

একজন রোগীর এন্ডোস্কোপি করা হচ্ছে

## কেন এন্ডোস্কোপি করা হয়

সাধারণত নিম্নোক্ত উপসর্গগুলো প্রকটভাবে দেখা দিলে এন্ডোস্কোপি করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারগণ সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারেন।

- বুক জ্বালা-পোড়া করলে
- বমিবমি ভাব হলে
- খাবারে অরুচি থাকলে
- পেটব্যথা হলে (প্রধানত উপরের পেটব্যথা)
- বমি বা রক্তবমি হলে
- আলকাতরার মতো কালো পায়খানা হলে
- ঢোক গিলতে সমস্যা হলে
- খাবার খাওয়ার সাথেসাথে বমি হলে
- পাকস্থলিতে কোনো আলসার বা টিউমার থাকলে
- পেট ফাঁপা মনে হলে

## কীভাবে এন্ডোস্কোপির প্রস্তুতি নিতে হয়

এন্ডোস্কোপি করার জন্য যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

- এন্ডোস্কোপির আগে ১০-১২ ঘণ্টা রোগী কিছু খাবেন না
- রোগীকে কিছু Laxative-জাতীয় ওষুধ দেওয়া হবে যেন পেট পরিস্কার থাকে
- এন্ডোস্কোপি করার আগে ডাক্তার রোগীকে কিছু পরীক্ষা করে দেখবেন রোগী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত কি না
- রোগী আগে কোনো ওষুধ খেয়ে থাকলে এই পরীক্ষার জন্য হয়তো তা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হতে পারে
- এই পরীক্ষার সময় লোকাল অ্যানেসথেশিয়া ব্যবহার করা হয়, যার ফলে পরীক্ষার পর কয়েক ঘণ্টা রোগীর একটু অস্বস্তি লাগতে পারে।

## এন্ডোস্কোপির প্রক্রিয়া

প্রথমে রোগীকে একটি টেবিলে শু'তে বলা হয়। তারপর ডাক্তার ধীরেধীরে একটি নরম রাবারের নল রোগীর খাদ্যনালীতে, পায়ুপথে বা শরীরের অন্য কোনো অংশে ঢোকান। রাবার নলের সাথে সংযুক্ত ক্যামেরা দিয়ে ডাক্তার টিভি স্ক্রিনে ভিতরের সমস্ত কিছু দেখতে পান। এই পরীক্ষা করার সময় সাময়িকভাবে লোকাল অ্যানেসথেশিয়া স্প্রে করা হয় যেন পরীক্ষা করার সময় রোগীর ব্যথা কম লাগে। ভিতরে কোনো আলসার বা টিউমার দেখা গেলে সেখান থেকে মাংস নিয়ে Biopsy পরীক্ষা করা হয়।

## এন্ডোস্কোপি করার সময় কী কী সমস্যা হতে পারে

সার্জারির চেয়ে এন্ডোস্কোপির ঝুঁকি অনেক কম কিন্তু তারপরও নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো হতে পারে:

- বুকে ব্যথা
- যেখান দিয়ে টিউব যায় সেখানে রক্তপাত হতে পারে
- জ্বর
- যেখানে এন্ডোস্কোপি করা হয় সেখানে ব্যথা হতে পারে

## এন্ডোস্কোপির দ্বারা কী কী রোগ নির্ণয় করা যায়

- গ্যাস্ট্রো-ইসোফেজিয়াল রিফ্ল্যাক্স ডিজিজ
- আলসার
- টিউমার/ক্যান্সার
- সিলিয়াক ডিজিজ
- রক্তশূন্যতা
- পেটে জ্বালা-পোড়া
- খাদ্যনালী সরু হয়ে-যাওয়া
- খাদ্যনালীর ক্যান্সার
- রক্তনালী বন্ধ করা
- মোটা রক্তনালী চিহ্নিত করা
- পাকস্থলি বা খাদ্যনালীতে পলিপ চিহ্নিত করা

এন্ডোস্কোপি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই পরীক্ষা ডাক্তার বা সার্জনদেরকে রোগ নির্ণয়ে অনেক সাহায্য করছে। তবে ধীরেধীরে এন্ডোস্কোপির ক্ষেত্রে আরো নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হতে পারে। ■

**স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান**
যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।